KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কল-১৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : Award Issue 6/3 6/4 7/2	Year of Publication : April 1983 April - June 1983 July - Sep 1983 May 1984
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বিভাব

সম্পাদক ॥ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বিভাব

দিলীপকুমার গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার সংখ্যা

তৃতীয় বর্ষ

২৬ এপ্রিল : ১৯৮৩

In 1912 we called it Community Relations

Even in the early years the gesture came easily, naturally. For it was an extension of the view that our Founder, Jamsetji Tata, always held. Showing sympathy and concern for employees. Putting their welfare, their safety and their happiness above all else. Through the years the Tata Steel chronicle is studded with pioneering moves in employee welfare and community relations. Numerous 'firsts', including the eight-hour day introduced in 1912, long before the concept caught on in the west. Although all this was somewhat removed from the copy book definition of public relations, it was in essence the precursor of PR as we know it today.

With the passage of years and the growing of our universe our PR office was set up which has been a trailblazer in PR activities in the country for over thirty years.

TATA STEEL

HTC-TIS-4602

ডি. কে. এবং আমরা কজন

নৃপেন্দ্র সান্যাল

ডি.কে-র সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনটির কথা এখনো বেশ স্পষ্ট। আমি তখন এম. এ. ক্লাসের ছাত্র। আমাদের দর্শনবিভাগ থেকে একটি প্রাচীর-পত্রিকা বার করার সিদ্ধান্ত হ'লো। মুক্তোর মতো হাতের লেখায় আগাগোড়া পত্রিকাটি লিখে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন গৌরী গুহরায়। পরে পদবী বদলে হয়েছেন মিত্র। এমন কি নাম পর্যন্ত ঠিক হ'য়ে গেলো। কিন্তু হেডপীস্ আঁকার লোক নেই। সমস্যাটির কথা শ্রদ্ধেয় বন্ধু আতাউর রহমান সাহেবকে বললাম। একদিন, মনে আছে, এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসের মধ্যে এক ঘন্টার ছুটিতে তিনি গেলেন কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটে এক বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের অফিসে। সেখানে যে এক বিরাটদেহী মানুষের সমীপে তিনি আমায় উপস্থিত করলেন তিনি ডি. কে.। তখন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে একটি আর্টওয়ার্ক দেখছিলেন। রহমন সাহেবের সঙ্গে ডি. কে-র পরিচয় ছিলো দীর্ঘকালের। ফলে তাঁর পক্ষে সহজেই সম্ভব হয়েছিলো আমাদের সমস্যার কথা উপস্থিত করা। আমার আশ্চর্য বোধ হ'লো, আমি অভিভূত হয়েছিলাম দেখে যে, যে-মনোযোগের সঙ্গে তিনি আর্টওয়ার্ক দেখছিলেন, ঠিক তেমনি মনোযোগের সঙ্গে তিনি রহমান সাহেবের কথা শুনলেন। তারপর হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পারসপেকটিভ' নাম রাখলেন কেন আপনারা? বলতে কি, তেমন ভেবে চিন্তে আমরা আমাদের প্রাচীর-পত্রিকার ওই নাম ঠিক করিনি। দর্শনবিভাগের পত্রিকার পক্ষে নামটা বেশ লাগসই হবে, এই মনে ক'রেই আমরা নামটা ঠিক করেছিলাম। তাই এক্ষেত্রে উত্তরটা সঙ্গে-সঙ্গে মুখে জোগালো না। আমাকে একটু ইতস্তত করতে দেখে বললেন, 'এই তো, ব্যাপারটা ভেবে দেখেননি বুঝি?' অদ্ভুত গম্ভীর কণ্ঠস্বর ছিলো ডি. কে-র। ঘরটা গমগম ক'রে উঠলো। কী যেন খানিক ভাবলেন তিনি, বললেন, 'ঠিক আছে, ও. সি-কে বলবো, ভালো একটা মাস্টহেড ক'রে দিতে। মনে-মনে তখন তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। এত সহজে আমাকে আমার অস্বস্তি থেকে মুক্তি দেবার জন্য।

অনেক পরে যখন ডি. কে-র সঙ্গে কাজ করতে যাই, তখন প্রথম সাক্ষাতের সেই অভিজ্ঞতার কথা আমার প্রায়ই মনে হ'তো তাঁর কাজ করার ধরণ দেখে। যা-কিছু করণীয় তাঁর কাছে আসুক না কেন, তার অর্থ বুঝে, লক্ষ্য এবং উপলক্ষ্য বিচার ক'রে বিষয়টি নিয়ে তিনি নানাভাবে ভাবতেন। তারপর কাজটায় হাত দিতেন। আর এই ভাবনার সময় তিনি হাত মুঠো ক'রে ঠোঁট এবং চিবুকের ওপর রাখতেন। এ-প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ডি. কে-র কাছে বিজ্ঞাপনে হাতেখড়ি দিয়ে কাজ শিখেছেন এমন এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, মুঠোর মধ্যে ডি. কে. তাঁর 'আইডিয়া'গুলো ভ'রে রাখেন, যাতে যথাস্থানে পৌছে দেবার আগে সেগুলো আর পালিয়ে যেতে না পারে।

প্রথম সাক্ষাতের পর অনেক দিন কেটে গেছে! আমার পড়াশুনোর পাটও গেছে চুকে। পরিপূর্ণ সাবালক হওয়ার বাসনায় একদিন চৌরঙ্গীর সামনে দিয়ে হেঁটে ফিরছি, হঠাৎ কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রায় সামনাসামনি প'ড়ে গেলাম। স্বভাবমতো, আমাকে কথা বলার কোনো সুযোগ না দিয়েই জোর ক'রে আমার হাত ধ'রে একটি দক্ষিণগামী বাসে উঠে পড়লেন। আমরা এসে থামলাম চৌরঙ্গী আর এলগিন রোডের মুখে! তারপর একটু হাঁটা এবং শেষ পর্যন্ত সিগনেট প্রেসের অফিসে গিয়ে হাজির! ওই হলটিকে সিগনেট প্রেস-এর অফিস বলার চেয়ে বলা উচিত ডি. কে-র কর্মশালা। দেওয়াল জুড়ে অসংখ্য শেল্‌ফ। সেখানে সুন্দর ক'রে সাজানো নানা ধরণের, নানা স্বাদের বই। মাঝখানে সোফা-সেটি, এবং তারই ডানদিকে বড়ো একটি টেবিল, মাঝখানে বইয়ের প্রুফ ও অন্যান্য কাজের জিনিশ। টেবিল ঘিরে অনেকগুলি চেয়ার! ডি. কে. তাঁর চেয়ারে ব'সে কতকগুলি মেশিন-প্রুফ দেখছিলেন। একটু পরেই বুঝতে পারলাম, নীরেনদার ওখানে যাওয়ার এমন বিশেষ তাড়া কেন? তাঁর কবিতার বই 'নীল নির্জন' তখন সিগনেট প্রকাশ করার তোড়-জোড় করছে। ডি. কে. নীরেনদাকে ডেকেছিলেন, বইয়ের মলাটটা একবার দেখার জন্য। এই কাজটুকু সারতে তাঁদের বেশি সময় লাগেনি। তারপর নানা বিষয় নিয়ে তাঁরা অনেকক্ষণ ধ'রে আলাপ করলেন। উঠে আসার আগে নীরেনদা আমাকে তাঁর সঙ্গে আরো একবার পরিচয় করিয়ে দিলেন! ডি. কে. সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কি করা হয়?'

এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারিনি। কারণ, সত্যি বলতে কি, তখন কিছুই আমি করতাম না যা বলার মতো। নীরেনদা আমার অসোয়াস্তি

বুঝতে পেরেই বোধহয় বলেছিলেন, 'ও লেখে টেখে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর লেখা আমি দেখেছি।' পরে জানতে পেরেছিলাম 'দিন-দুপুরে'-র যে-সমালোচনা চতুরঙ্গে বেরিয়েছিলো, ডি. কে-র তা পছন্দ হয়নি। তিনি একদিন এ-প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'ওটা তো মন্তব্য হয়েছে, আলোচনা কোথায়?'

বাইরে এসে নীরেনদা বলেছিলেন, 'আধুনিক কবিদের এত বড়ো শুভার্থী আর নেই। আর্থিক ক্ষতির কথা না ভেবেই সিগনেটের পক্ষ থেকে একের পর এক কবিতার বই প্রকাশ ক'রে চলেছেন'।

তারপর আবার বহুদিনের বিরতি। ডি. কে-র সঙ্গে আবার যোগাযোগ ঘটলো বেঙ্গল হোম ইণ্ডাস্ট্রিজের কোনো একটি বিশেষ অনুষ্ঠান কেন্দ্র ক'রে। একটি সভা হয়েছিলো পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর পৌরোহিত্যে। আর একটি ছোটো পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিলো এই উপলক্ষে। এর মুদ্রণ-পারিপাট্যের উল্লেখ না ক'রেই বলা যায় যে, পুস্তিকাটির বহু সংখ্যক কপি অতিরিক্ত ছাপতে হয়েছিলো, বিদেশে বিভিন্ন ভারতীয় দূতাবাসে পাঠানোর জন্য। তখন তাঁকে সাহায্য করার জন্য একজন দৌড়ঝাঁপ-করিয়ে লোক দরকার হয়েছিলো। দৌড়-ঝাঁপ কতটা করেছিলাম জানি না, তবে কাজটা করেছিলাম। হোম ইণ্ডাস্ট্রিজের তখন তেমন আর্থিক সাচ্ছল্য ছিলো না যে বহুবর্ণশোভিত পুস্তিকা প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু ডি. কে. 'ওপেন' ও রিভার্স ডটের ব্যবহার ক'রে বহু বর্ণের 'ইফেক্ট' এনেছিলেন মাত্র তিনটি রঙের ব্যবহার ক'রে।

এর পর আবার ডি-কে-র সঙ্গে যোগাযোগ হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার দপ্তরের একটি ছবি করা উপলক্ষে। মূলত এই ছবি তৈরির প্রেরণা ছিলো বেঙ্গল হোম ইণ্ডাস্ট্রিজ-এর সেই প্রদর্শনী। এই ছবির কাজ হচ্ছিলো তখন অরোরা ফিল্ম-এর স্টুডিওতে, নারকেলডাঙায়। সমস্ত দিন ধরে প্রত্যেকটি শট দেখে ডি.কে. সেদিন স্টুডিও ছেড়েছিলেন। ডি.কে. চ'লে যাওয়ার পর অরোরার শ্রীঅজিত বসু আমাকে বলেছিলেন, 'আলতাফ হোসেনের সময় ছবির স্ক্রিপ্ট থেকে চিত্রগ্রহণ পর্যন্ত সবই ডি.কে. করতেন। এবং এ-কাজ করতেন নেহাতই কাজের আনন্দে, বিনা পারিশ্রমিকে। আলতাফ সাহেবের আর কারো কাজ পছন্দ হ'তো না। ডি. কে. তখন ডি. জে. কীমার বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের সহকারী ম্যানেজার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,

আলতাফ হোসেন দেশভাগের আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচারঅধিকর্তা ছিলেন। পরে 'ডন' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর কীমার ছিলো প্রথম সারির সর্বভারতীয় একটি বিশিষ্ট বিজ্ঞাপন সংস্থা।

ইতিমধ্যে অনেকগুলি ঘটনা ঘটলো কলকাতার বিজ্ঞাপন জগতে। ডি জে. কীমার বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের কলকাতা অফিসটি বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'লো। ডি.কে-কে (আমি ওঁর কাছ থেকেই শুনেছিলাম) রেসিডেন্ট ডিরেক্টর হিশেবে কীমারের কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছিলো। কিন্তু তিনি রাজী হননি, কারণ অন্যান্য সহকর্মীদের বাদ দিয়ে একক ভাবে কীমারের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চাননি। অবশ্য কীমারের কর্মীরা একত্রে যখন ক্ল্যারিয়ন অ্যাডভার্টাইজিং সার্ভিসের পত্তন করলেন, তার কর্ণধারেরা ডি-কে-কে ডাকেননি। এই ঘটনা সকলেরই বিস্ময়ের কারণ হয়েছিলো। ডি কে. যোগ দিলেন প্রেস সিণ্ডিকেটে, এবং এসেই তাঁদের বিজ্ঞাপনের চেহারা বদলে দিলেন। তাঁর পরিকল্পিত ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স-এর প্রাচীরপত্র পুরস্কার পেলো। স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল-এর বিজ্ঞাপন মুখে-মুখে ফিরতো। এ-বিষয়ে ডি. কে-কে পরে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাঁর মতে ওষুধ কোম্পানির প্রধান ত্রুটি হ'লো যে ডাক্তারদের সেখানে উপেক্ষা করা হয়। তিনি সেজন্যই কপি হেডলাইনে বলেছিলেন, যদি অমুক অসুখ আপনার হ'য়ে থাকে তো আপনার ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করুণ, স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালের অমুক ওষুধ খাবেন কি-না। এই বিজ্ঞাপনের শক্ত বিন্দু ছিলো এই যে এতে ডাক্তারদের অহমিকা কোথাও আহত হ'লো না। তেমনি রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন 'ডাইরেক্ট মেইল' বিজ্ঞাপন চিন্তায়। ডাক্তারদের কাছে প্রতিদিন অসংখ্য এমন বিজ্ঞাপন আসে ব্লটিং পেপার হিশেবে অথবা তারিখ দেখতেও যেগুলো কেউ জমিয়ে রাখেন না। ডি.কে. এই সব বিজ্ঞাপনে দুর্মূল্য চিত্র বা বিরল ভাস্কর্যের ব্যবহার করতেন, বিজ্ঞাপন ছাড়াও যার অন্য একটি মূল্য আছে। এ-প্রসঙ্গে তাঁর পরিকল্পিত বার্মা শেল কোম্পানির 'ডাইরেক্ট মেইল' উল্লেখযোগ্য।

সময়টা তখন ১৯৫৭ সালের মাঝামাঝি। হঠাৎ একদিন টেলিফোন পেলাম: কিছু-কিছু কাজ করাতে চাই আপনাকে দিয়ে। যদি সময় করতে পারেন, সন্ধ্যের দিকে আসবেন।' টেলিফোনে এর বেশি কথা ডি কে. বলেননি। কিন্তু আমার মধ্যে ইতস্তত ছিলো অনেক। শুনেছিলাম কোনো কাজই তাঁর মনঃপূত হয় না। কাজের ব্যাপারে অসম্ভব খুঁতখুঁতে, বিশেষ

ক'রে লেখার ব্যাপারে। আশ্চর্য বাংলা গদ্য লিখতেন নিজে, সংক্ষেপ অথচ অর্থবহ। বলতেন, 'আমাদের ভাষায় ক্রিয়াপদটিই যতো গোল বাধায়।' এ-বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলেই তাঁর গদ্য ক্রিয়াপদের পরিমিত ব্যবহারে হ'য়ে উঠতো বিশিষ্ট।

যথেষ্ট সঙ্কোচ নিয়ে, টেলিফোন পাবার পরের দিন সন্ধ্যায় তাঁর এলগিন রোডের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম, একটি রিডাকসন্ লেন্স্ নিয়ে অনেকগুলি লাইন ড্রইং-এর ব্রোমাইড প্রিণ্ট দেখছেন। একখানা আমার হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেখুন তো, লাইনগুলো রিডাকসন্ স্ট্যাণ্ড করতে পারছে কি না?' বলতে কি, আমার অশিক্ষিত চোখে তেমন একটা তারতম্য বুঝতে পারিনি। তখন নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললেন, 'লাইনগুলো একটু মোটা দেখাতে বাধ্য।' বোধহয় এই কারণেই তিনি 'সেম সাইজ' আর্ট-ওয়ার্কের পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ, তাঁর মতে, বিজ্ঞাপনের বস্তু আর্টওয়ার্ক থেকে ছোট অথবা বড়ো যাই করা হোক না কেন, রূপভঙ্গ (ডিস-টর্‌সন) ঘটবেই। বলার অপেক্ষা রাখে না, 'সেমসাইজ আর্টওয়ার্ক'ও, তিনি বলেছিলেন, 'তেমন নিপুণ এচার না থাকলে ব্লকে কিছু ভোঁতা দেখাতে বাধ্য।'

হাতের কাজ সরিয়ে রেখে ডি.কে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন, 'টুকরো কথা'র কিছু কাজ করা সম্ভব হবে কি না। বলতে বাধা নেই, নরেশ গুহ মহাশয় 'টুকরো কথা'র একটি বিশিষ্ট চরিত্র তৈরি করেছিলেন। সে সময় ব্যক্তিগত কিছু অসুবিধা থাকায় তিনি আর 'টুকরো কথা'র কাজ নিজে করতে পারছিলেন না, ফলে প্রকাশও যথেষ্ট অনিয়মিত হ'য়ে পড়েছিলো। ডি.কে. সে-কথা জানতেন। কথার পিঠেই তিনি ব'লে নিলেন, 'অবশ্য নরেশবাবুর মতো আপনি লিখবেন, এমন আশা আমি করি না।'

সেই থেকে ১৯৫৮ সালের জুন পর্যন্ত প্রতি শনিবার সন্ধ্যার পর ডি কে-র এলগিন রোডের বাড়ি গিয়েছি। গল্পই হয়েছে বেশি। ফাঁকে-ফাঁকে কখনো সিগনেটের কোনো বইয়ের 'ব্লার্ব' লিখেছি, কখনো অনুবাদ করেছি কোনো বই। (যতদূর মনে পড়ে ভবানী ভট্টাচার্যের লেখা 'দি ম্যান হু রাইড্‌স দি টাইগার' বইটির আমি অনুবাদ করি। ডি.কে. বাংলায় নামকরণ করেছিলেন— 'শার্দূল সওয়ার'। বইটি প্রকাশিত হয়নি।) তাঁর এই শনিবারের বৈঠকে নিয়মিত যোগদানকারী ছিলাম একমাত্র আমি। অনেক রাত পর্যন্ত নানা

বিষয় নিয়ে কথা হ'তো। শেষে অনেকদিন এমন হয়েছে যে যানবাহন বন্ধ হ'য়ে গেছে, ডি.কে. নিজে তাঁর ছোট গাড়িটা বার ক'রে, এলগিন রোড থেকে কলেজ স্ট্রীট পর্যন্ত নিজে ড্রাইভ ক'রে আমাকে পৌঁছে দিতেন। এটা আমার বেলায় নতুন কিছু ছিলো না। কমলকুমার মজুমদারের অভিজ্ঞতাও একই। তিনি তো থাকতেন আরো দূরে। ডি.কে-র আতিথেয়তাবোধ, তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন, সকলের কাছেই স্মরণীয়।

উনিশশো সাতান্ন সালের মাঝামাঝি সময়ে ডি.কে-র সঙ্গে প্রেস সিন্ডিকেটের সংশ্রব ছিন্ন হয়। তারপর সাময়িকভাবে তিনি ঠিক করেছিলেন বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানে আর যোগ দেবেন না। সিগনেট প্রেসকেই আরো উন্নত উজ্জীবিত ক'রে তুলবেন। সে-সময়ে কয়েকটি বইয়েরও তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। কী আশ্চর্য সেই সম্পাদনা! দুঃখের বিষয়, তাঁর সম্পাদিত শ্রীম-র সেই জীবনী প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু বেশিদিন তিনি বিজ্ঞাপনের আকর্ষণ থেকে দূরে থাকতে পারেননি। ও-বছরেরই শেষের দিকে বাটা শু কোম্পানিতে অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার হিশেবে যোগ দেন।

অক্লান্ত পরিশ্রম কথাটা বোধহয় ডি. কে-র সঙ্গে কাজ করলে বলা যায় না। কাজের ব্যাপারে তাঁকে বলা যেতো অ্যাবসোলিউট অর্থে 'পারফেকসানিস্ট'। অসম্ভব খুঁতখুঁতে ছিলেন। যেদিন তিনি আমাদের একসঙ্গে একাধিক কাজে মনোনয়ন করতেন, সেটি ছিলো আমাদের পক্ষে একটি বিশিষ্ট দিন। এবং তেমন-তেমন দিন, কদাচ আমাদের এসেছে।

এই যে কাজের বিষয়ে এমন অখুশি হওয়া, সেটি কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিলো না! তিনি তাঁর নিজের কাজেরও ছিলেন মস্ত বড়ো সমালোচক। বহু কপি নিজে লিখে নির্মম হাতে তা ছিঁড়ে ফেলেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো সময়ের চাপের কাছে তাঁকে নতিস্বীকার করতে হ'তো। হয়তো অনেক সময় তেমন আঁটোসাটো কপি তাঁর হাত থেকে আসেনি। তার কারণ, সমস্ত দিন অফিস ক'রে, রাত সাতটা আটটায় বাড়ি ফিরে সারারাত জেগে তাঁকে কপি করতে হতো। ওর কপি ছিলো অদ্ভুত মাপা। পেন্সিলরাফ দেখে মেপে এবং গুণে তিনি শব্দ বসাতেন। লে-আউট অনুসারে সেটি ফিরে এলে দেখা যেতো একেবারে মিলে গেছে। একটিও 'ব্যাড লাইন' নেই।

শুধু কপি লিখতে বা দেখতেই তাঁর রাত্রি জাগতে হ'তো না। আগাগোড়া

মেক-আপ প্রুফ তিনি নিজে দেখতেন। ছাপাখানার কর্মীরা আমায় বলেছেন, ডি.কে-র প্রুফ এমনই যে তাঁদের কিছু করার থাকে না। পোস্টার শো-কার্ড, আই ক্যাচার—যাবতীয় ছাপার কাজের শেষ প্রুফটি ডি.কে নিজে দেখতেন। যেটু কুসংশোধন করতেন সেটুকু করা হলে দেখেছি, সমস্ত জিনিসটারই চেহারা বদলে গেছে।

ডি. কে-র প্রেস কপি মার্ক করা ছিলো অনুকরণীয়। যে-কোনো কপিই প্রেসে পাঠানো হোক না কেন তিনি তা 'ডাব্‌ল স্পেসে' টাইপ করাতেন। প্রথম কার্বনকপিটি পাঠাতেন প্রেসে, কারণ সেটি বেশি পরিষ্কার ও স্পষ্ট দেখাতো। প্যারা ইনডেন্ট কতোখানি হবে, কতো পয়েন্ট টাইপ কতো পয়েন্ট বডির ওপর গেলে মানানসই হয়, তার একটি নমুনা দেখে ফেস মার্ক করতেন। এবং তাঁর মার্কিং অনুসরণ করলে প্রুফে সামান্য কম্পোজিং-এর ভুল ছাড়া আর কিছু সংশোধন করতে হ'তো না। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে টাইপ করা কপির উপরে ডানদিকে স্পষ্ট করে নির্দেশগুলি লিখতেন। যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয়, অথবা বেশি মাথা ঘামাতে না হয় প্রেসের কম্পোজিটারের। □

'বিতর্কিকা' প্রসঙ্গে

অভ্র ঘোষ
স্বাগতা চন্দ্র

'বিতর্কিকা' ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির উদ্দেশ্য কী এ বিষয়ে এই পত্রিকার প্রাথমিক পরিচয় পত্রে যা বলা হয়েছিল তারপর নতুন করে বলার কিছু নেই। এই প্রসঙ্গে সেই পরিচয় আবার দেওয়া যাক।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বেশীর ভাগ পত্র-পত্রিকায় গ্রন্থ-সমালোচনা নেহাৎ নিয়মরক্ষার ব্যাপার। কখনও কখনও এসব লেখা শুধুই মন্তব্যময়, আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তা হয়ে ওঠে নিতান্তই পুস্তক-পরিচিতি। এ দোষ সমালোচকের নয়। স্বল্প পরিমান পাঠকের সামনে আলোচ্য বইটির বিষয়বস্তু তুলে ধরা ছাড়া আর উপায়ই বা কি থাকে তাঁর? দীর্ঘদিন ধরে বাংলা গ্রন্থ-সমালোচনার সাহিত্যে এই রীতিই তৈরী হয়ে গেছে। ব্যতিক্রম যে কিছু কিছু ঘটেনা তা নয়, তবে তা ব্যতিক্রমই।

সাহিত্য-শিল্প-সমাজ-ইতিহাস-বিজ্ঞান বা যে কোন সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনার প্রগতিরক্ষেত্রে গ্রন্থ-সমালোচনার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সমালোচকই পারেন কোনো এক গ্রন্থের সমালোচনায় আরও নানা চিন্তার সূত্র ধরিয়ে দিতে কিংবা সরাসরি বিরুদ্ধ আরেক চিন্তার প্রকাশ ঘটাতে। এতে পাঠকের লাভ বৈ লোকসান কিছু ঘটেনা। তর্কেবিতর্কে নিজের চিন্তা-অনুভূতিকে স্বচ্ছ করে নিতে বরং সুবিধেই হয় পাঠকের, এমনকি লেখকেরও।

বিতর্কিকা এরকম গ্রন্থ-সমালোচনারই একটি বাংলা ত্রৈমাসিক। এর মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন কিছু বই-এর আলোচনা আমরা শুধু করতে চাইছিনা আমরা চাইছি প্রত্যেক সংখ্যায় বিশেষ একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক কিছু কিছু বই বেছে নিয়ে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হবার এবং পাঠকের সঙ্গে নানান সমালোচকের চিন্তার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবার। সে কারণে আমাদের চেষ্টা থাকবে একই গ্রন্থ-প্রসঙ্গে একাধিক লেখকের সমালোচনা একসঙ্গে প্রকাশ করবার। এতে আমাদের ধারণা কোন একটি গ্রন্থের সম্যক মূল্য নিরূপিত

হবার সম্ভাবনা থাকে এবং নানা দৃষ্টিকোণের সহায়তায় পাঠকের দৃষ্টিকেও এতে প্রসারিত করে দেওয়া যায়। প্রাসঙ্গিক বিতর্কেরও অবতারণা করা যায়।

বিতর্কিকার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে আমাদের কাছে প্রধান দুটি অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতি এবং স্বচ্ছ, সৃজনশীল লেখা পাওয়া।

যথেষ্ট পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন, কেননা এই গ্রন্থের কলেবর কিঞ্চিৎ বৃহৎ হওয়াই স্বাভাবিক; যেহেতু আমাদের আন্তরিক উদ্দেশ্য সমালোচককে প্রকৃত সুস্থ ও সম্পূর্ণ সমালোচনার জন্য যথেষ্ট স্থান দেওয়া। একই গ্রন্থের ওপরে বিভিন্ন মতাবলম্বী সমালোচনা যাতে পাঠকসমাজে বিতর্কের অবতারণা ক'রে আমাদের এই পত্রিকার অংশীদার হন এটাই ছিল আমাদের কাম্য।

অতএব বিতর্কিকার সূচনাতেই এর প্রাথমিক উদ্যোক্তারা যে ভাবনায় পীড়িত হয়ে পড়লেন তা হল অর্থচিন্তা। বিক্রীত বই-এর থেকে এই পরিমান অর্থপ্রাপ্তির আশা নেহাৎই কল্পনা। কেননা গ্রন্থ-সমালোচনার পত্রিকা-পাঠকের সংখ্যা সত্যই হয়তো বেশী নেই। তবুও যে সৃষ্টির পরিকল্পনা মাথায় এল তা যাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট না হয় সেই চেষ্টায় মেতে ওঠা হল। যদিও খঞ্জ লোকের এভারেষ্ট অভিযান সার্থক হতে পারেনা, কিছুদিন গুলতানি, তর্কবিতর্কের পর পত্রিকা বার করার দৃঢ় প্রচেষ্টায় সেই অভিযানই শুরু করা গেল। ধীরে ধীরে পৃষ্ঠপোষকদের সহায়তায় এবং কিছু কিছু বিজ্ঞাপন সংগ্রহ ক'রে কোনো মতে পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকল।

অবশ্য শুধুই অর্থই যে বাধা তা নয়। 'ভাল' (অর্থাৎ আমরা যা চাই) লেখা সংগ্রহ করাও দুঃসাধ্য ব্যাপার।

স্বেচ্ছাসেবী লেখকদের সময়ের অভাব থাকায় নির্দিষ্ট সময়ে তাঁদের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ করা যে কত কঠিন ব্যাপার তা তো পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সকল ব্যক্তিই জানেন, তার ওপর আমাদের 'উদ্দেশ্য' স্পষ্টভাবে লেখকদের সামনে ব্যক্ত করা হয়েছিল। ফলে তাঁরাও খানিকটা সচেতন হয়েই সময় কিছু বেশী চেয়েছেন। এরজন্য পত্রিকা অনেকবারই নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ করা যায়নি। শুধু তাই নয়, শেষ মুহূর্তে নির্দিষ্ট লেখা হাতে না পাওয়ায় কোন কোন গ্রন্থের সমালোচনা আশানুরূপ হয়নি।

এ ছাড়া এই পত্রিকার আরেকটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল পরিচালনা করবার অভিজ্ঞতার অভাব। যে সমস্ত অসুবিধা এতক্ষণ আলোচনা করা হ'ল তার অনেকটাই হয়তো লাঘব হ'ত যদি অভিজ্ঞ পরিচালককে পাওয়া যেত।

শুধু সাহিত্যের নেশায় পাগল না হয়ে যদি এই পত্রিকা পরিচালনায় খানিকটা পেশাদারী দৃষ্টি আরোপ করা যেত তবে বেশ কিছু সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। যার জন্যে এই পত্রিকা পরিচালনার ভার শেষ পর্যন্ত 'প্যাপিরাস'-এর হাতে দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় এই সংস্থার অভিজ্ঞ পরিচালনা এবং বিতর্কিকার-সম্পাদকের আন্তরিকতা এই দুই-এর সহযোগিতায় বিতর্কিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হবে এবং সমালোচনা সাহিত্যে এক প্রয়োজনীয় অধ্যায় সংযোজন করবে।

গ্রন্থ সমালোচনার এই ত্রৈমাসিক শুরু হয় ১৩৮৮ বৈশাখ-আষাঢ়ে। প্রথম সংখ্যাটি ছিল আত্মস্মৃতি সম্পর্কীয় কিছু গ্রন্থের আলোচনা। দ্বিতীয় সংখ্যা ছিল নকশালবাড়ি সংখ্যা—নকশালবাড়ি-নির্ভর রাজনীতির সাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থের আলোচনা। এটা বের হয় শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৮। তৃতীয় সংখ্যা, বসন্ত ১৩৮৮ ছিল নাট্য-আন্দোলন সংখ্যা। চতুর্থ সংখ্যা, বর্ষা ১৩৮৮ হয়েছিল রবীন্দ্রচর্চা বিষয়ে। ১৩৮৯-এ বেরিয়েছে মাত্র দুটি সংখ্যা, প্রথমটি সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক সংখ্যা, দ্বিতীয়টি চলচ্চিত্র বিষয়ে। ১৩৮৯ এ প্যাপিরাস পরিচালনাভার গ্রহণ করেছেন। পরবর্তী সংখ্যা হবে উপন্যাস-সংখ্যা। □

অভিনন্দন

বিভাব আয়োজিত
দিলীপকুমার গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার
তৃতীয় বর্ষ ১৯৮৩
নির্বাচিত পত্রিকার নাম
বিতর্কিকা
নির্বাচকমণ্ডলীতে ছিলেন :
নৃপেন্দ্র সান্যাল
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়
পবিত্র সরকার
সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

Get Peace of Mind and New Interest in Life.

You too can get peace and tranquillity when you can tackle the tough problems of your Children's Education, Marriage Expenditure or a dependable Retirement income.

Peace of mind comes with the sense of security alone. You can get both. when you save with us.

The Peerless General Finance & Investment Co. Ltd.

Estd : 1932.
Regd. Office : "PEERLESS BHAVAN"
3, Esplanade East, Calcutta—69,

Total Assets Over Rs. 325 Crores.

India's Largest Non-Banking Savings Company

BIVAV
D. K. Gupta Award Issue April 1983 RN 30017/76